সংখ্যার সংকেত

সুজন দাশগুপ্ত

(একেনবাবু গোয়েন্দা কাহিনী)

১. এবার প্ল্যান করে

এবার প্ল্যান করেই আমরা তিনজন ন'মাসের জন্যে দেশে থাকব বলে এসেছি। আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়ে রিসার্চের ছুতো করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে অতিথি অধ্যাপক হয়েছি। দেশেও থাকা হবে আর ছাত্র পড়াবার দায়িত্বও থাকবে না। সোনায় সোহাগা। রিসার্চের একটু-আধটু কাজ –সেটা করতে আমার ভালোই লাগে। প্রমথ ইউনিভার্সিটিকে পুরো গুডবাই করে ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যাচ্ছে। ওর ফিঁয়াসে ফ্রান্সিস্কা সুইটজারল্যান্ডে গেছে অসুস্থ মায়ের কাছে শেষ সময়টা থাকবে বলে। সুতরাং নিউ ইয়র্কে একা থাকার কোনও মানে হয় না, তাই প্রমথও চলে এসেছে। তবে এসেছে একটা চাকরি পাকা করেই। জয়েন করবে ন'মাস বাদে। এবং আমার যদ্দুর ধারণা এবার নিউ ইয়র্কে ফিরে ওর চাকুরি এবং বিবাহ –দুটোই হবে। দু'জনের চোখই আজকাল যেরকম প্রেমঘন দেখি। তবে একেনবাবুও যে আমাদের সঙ্গে আসবেন সেটা ভাবিনি। উনি এখন নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সড ডিটেকটিভ। হাতে দেদার কেস। কিন্তু উনিও দেখলাম টিকিট কেটে বাক্সপত্র গোছাচ্ছেন। প্রমথও অবাক। "আপনি আবার বাক্স গোছাচ্ছেন কেন? বেশ তো টু-পাইস আসছিল।"

"কী যে বলেন স্যার! আপনারা আর ম্যাডাম ফ্রান্সিস্কা ছাড়া নিউ ইয়র্কে কী আছে! তাছাড়া ফ্যামিলির ব্যাপারটাও তো আছে।"

প্রমথ যে প্রমথ –কটু কথা বলতে যার জুড়ি নেই। সেও দেখি চুপ।

এখানে বলি, ফ্যামিলি মানে একেনবউদি। একেনবউদির অবশ্যই একটা নাম আছে, সেটা হল মিনতি। কিন্তু একেনবউদি লিখে লিখে এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, যে মিনতিবউদি লিখলে অন্য কারও কথা বলছি মনে হয়।

তিনজনের কেউই আমরা ন'মাস নিউ ইয়র্কে থাকছি না, তাই অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিয়ে একটু-আধটু যা ছিল, সেগুলো একটা স্টোরেজে জমা রেখেছি। ফিরে এসে আবার নতুন একটা জায়গা খুঁজতে হবে। এরকম ভালো লোকেশনে জায়গা পাওয়াটা সহজ হবে না। কিন্তু আমাদের অফিসের সেক্রেটারি বেভ ভরসা দিয়েছে, ও একটা কিছু জোগাড় করে রাখবে। বেভ খুবই রিসোর্সফুল, আর আমাকে পছন্দ করে। না না, প্রেম-টেম নয় যদিও প্রমথ সেটা মানতে চায় না।

আমরা যখন সেপ্টেম্বরে এসেছি তখন খুবই গরম। অক্টোবরে নভেম্বরেও গরমটা ঠিক কাটেনি। এখন ডিসেম্বর। শীতের আমেজ একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে।

সেই সঙ্গে পশনটাও বেড়েছে। হাঁচি-কাশি ইত্যাদির কারণ ভাইরাস না পশন –সে বিতর্কে কার জয় হবে জানি না, কিন্তু ফলটা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ক'দিন ধরেই বেদম কাশছি। ভাগ্যিস আজ রোববার, কলেজ নেই। এই অবস্থায় কলেজ যাওয়া একটা বিড়ম্বনা।

সাধারণত রবিবার আমরা একেনবাবুর বাড়িতে আড্ডা মারি। আজকে প্ল্যানটা অন্যরকম। প্রমথ আগে থেকেই মাকে বলে রেখেছিল পাটিসাপটা খাবে। আমার আবদারে সব সময় সায় না দিলেও প্রমথর কথা মা ফেলতে পারেন না। সুতরাং বাড়িতে পাটিসাপটার আয়োজন হয়েছে। আমরা তিনজনে যখন চা খেতে খেতে পাটিসাপটা আসার অপেক্ষা করছি, তখন ছোটমামা ঘরে ঢুকলেন। ছোটোমামা রিটায়ার করার আগে বহুদিন আলিপুর জেলের জেলার ছিলেন।

প্রমথ ছোটোমামাকে চেনে, অপরিচিত শুধু একেনবাবু। উনি সোফায় বসতেই একেনবাবু সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে একেনবাবু হাতজোড় করে একেবারে মাথা নুইয়ে বললেন, “আমি কিন্তু স্যার, আপনাকে আগে দেখেছি।”

“তাই নাকি!” একেনবাবুর মাথা নোয়ানো আর কথা বলার ভঙ্গীতে কৌতুক বোধ করলেন ছোটোমামা।

“হ্যাঁ স্যার, আপনি তো আলিপুর জেলে ছিলেন?”

ছোটোমামা রহস্য করতে ভালোবাসেন। চোখ কপালে তুলে বললেন, “সর্বনাশ, এ তো ভালো কথা নয়, তুমিও সেখানে কয়েদি ছিলে?”

“কী যে বলেন স্যার…”

“একেনবাবু এক কালে সি.আই.ডি-তে কাজ করতেন,” আমি বললাম।

“তাই বলো।”

তখন হিসেব করে বার হল, ছোটমামা যে বছর রিটায়ার করেন একেনবাবু সে বছরই পুলিশে যোগ দেন।

ছোটোমামাকে আমার খুবই পছন্দ। সত্যিকারের গোপ্পে লোক। জেলার ছিলেন বলে নানান ধরনের অপরাধীর সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়েছিল –তাদের জীবনের বহু ঘটনাই উনি জানতেন। সেই সব কাহিনিগুলো নিয়ে বই লিখলে ‘জরাসন্ধের লৌহকপাট’ হয়তো হত না, কিন্তু বইটার কাটতি হত। কিন্তু লেখার কথা তুললেই ছোটোমামা বলতেন, “খেপেছিস, বানিয়ে বানিয়ে গল্প তো নয়, এগুলো সব সত্যিকারের সুখ-দুঃখের কাহিনি! বিশ্বাস করে যেগুলো লোকে বলেছে, সেগুলো লিখে নাম কিনতে আমি রাজি নই।”

“নামগুলো পালটে দাও আর বিভিন্ন চরিত্র পাঞ্চ করে এক একটা নতুন চরিত্র খাড়া কর।”

“তা মন্দ বলিসনি, তবে মনে হয় না এই বয়সে আমার লেখক হওয়া হবে বলে।”

লেখা প্রসঙ্গের সেইখানেই ইতি। তারপর আরম্ভ হতো নানান গল্প।

.

আজ আর লেখার কথা তুললাম না। সকালে পত্রিকায় পড়েছিলাম রাজা জগদীশনারায়ণের হত্যাকারী গজলাল প্যাটেল কুড়ি বছর শাস্তি ভোগ করে আলিপুর জেলে মারা গেছে। ছোট্ট কয়েক লাইনের খবর, চোখে কী করে পড়েছিল নিজেই জানি না। আলোচনা সেই নিয়েই শুরু হল।

গজলাল প্যাটেলের কেস নিয়ে এক কালে বেশ হইচই হয়েছিল। বয়স্কদের কারও কারও সে ঘটনা হয়তো মনে আছে। আমাদের জেনারেশনে সেটা মনে থাকার কথা নয়। আমি ঘটনাটা জানি, কারণ রাজা জগদীশনারায়ণকে আমার মা আর ছোটমামা দুজনেই চিনতেন। দাদুর বাড়ি ছিল হাবড়ায়। সেখান থেকে মাইল দশেক দূরে ছিল জদগীশনারায়ণের প্রাসাদতুল্য বাড়ি। এককালে পূর্ববঙ্গে ওঁর বিশাল জমিদারি ছিল, রাজা খেতাবটা বোধহয় তখনই পান। দেশবিভাগের কিছুদিন পর এদেশে চলে এসে কৈগাছিতে ওঁর বাড়িটা তৈরি করান। যখন উনি খুন হন তখন অবশ্য ওঁর পড়তি অবস্থা। দুপুর বেলায় খেতে বসেছিলেন, তিনজন আততায়ী হঠাৎ ঘরে ঢুকে ওঁকে গুলি করে। পুলিশ পরে তদন্ত করে আবিষ্কার করে যে স্থানীয় ব্যবসায়ী গজলাল প্যাটেল গুণ্ডাদের সাহায্য নিয়ে ওঁকে খুন করেছে। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন আমার বয়স বছর এগারো, অর্থাৎ প্রায় বাইশ বছর আগের ঘটনা।

গজলালের খবরটা ছোটোমামা নিজে পড়েননি, কিন্তু শুনেছেন। সকালে খবরটা পড়ার পর থেকে একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরছিল, সেটাই প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম। আমার ধারণা ছিল যাবজ্জীবন কারাবাস মানে চোদ্দো বছরের জেল। সেক্ষেত্রে গজলাল কুড়ি বছর জেলে থাকে কী করে?

ধারণাটা ভুল। ক্ষেত্র বিশেষে কুড়ি, পঁচিশ এমন কী তিরিশ বছরের কারাদণ্ডও হতে পারে। আর গজল শুধু একটা খুনের জন্য জেলে যায়নি, সাজা পেয়েছিল দু'টো খুনের জন্য। এটা ছিল আমার প্রশ্নের টেকনিক্যাল উত্তর। তবে এই প্রসঙ্গে যেটা ছোটোমামা বললেন, সেটা বেশ শকিং।

"দেখ, আমি ছিলাম জেলার। আমার দায়িত্ব ছিল সরকারি হুকুম মেনে কয়েদিদের ঠিকমতো দেখভাল করা, তারা দোষী না নির্দোষ –তার বিচার করা নয়। আমি অবাধে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। কেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সে নিয়ে প্রশ্ন করিনি। কেউ কেউ নিজের থেকেই এগিয়ে এসে তাদের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে। অনেকটা ক্যাথলিক খ্রিস্টান ফাদারের কাছে কনফেশন করার মতো। অনেকে আবার অভিযোগ জানিয়েছে বিনা অপরাধেই তাদের শাস্তি হয়েছে। সত্যি কি মিথ্যা, আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। কিন্তু গজলালের কথার সুরে এমন একটা কিছু ছিল যে, ওকে অবিশ্বাস করতে পারিনি।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং স্যার," একেনবাবু বললেন। "তারমানে আপনার ধারণা লোকটা খুন করেনি?"

"গজলাল নিজে খুন করেনি। গুণ্ডাদের এনে খুন করিয়েছিল বলে ওকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হল, সত্যি সত্যিই সেটা করিয়েছিল কি না। ওর কেসটা নিয়ে আমি তোমাদের সি.আই.ডি-র রথীন দত্তের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলাম। রথীন দত্তকে চেনো?" একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ছোটোমামা।

"নিশ্চয়ই স্যার, আমাদের সবার বস ছিলেন।"

"রথীন ছিল ওই কেসটার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। রথীন অবশ্য শিওর ছিল যে ওর তদন্তে কোনো ভুল নেই। হি মে বি রাইট। আমি শুধু আমার ফিলিং এর কথা বলছি। আসলে আমরা সবাই ছিলাম শাসনচক্রের শিকলে বাঁধা। রথীন যদি বুঝতেও পেরে থাকে কোথাও ভুল হয়েছে –সেটা শোধরানো সহজ ব্যাপার ছিল না।"

"আর এখন তো সেটা অসম্ভব স্যার।"

"ঠিক, গজলাল আমাদের আইন-আদালতের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। তবে কী জানো, গজলালের ব্যাপারটা আমাকে এত নাড়া দিয়েছিল যে, রিটায়ার করার পরে, আমি ঠিক করেছিলাম নিজেই তদন্ত করব।

কেস ফাইলও কিছু ঘেঁটেছিলাম, এমনকী কৈগাছিতে, মানে যেখানে রাজা জগদীশনারায়ণ খুন হয়েছিলেন সেখানেও গিয়েছিলাম লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই বুঝলাম গোয়েন্দা হবার এলেম আমার নেই।"

প্রমথ বলে উঠল, "এলেমদার গোয়েন্দা তো এখানে আছেন, তাঁকে কাজে লাগান।"

ছোটোমামা একটু হেসে বললেন, "আগে ওকে চিনলে তো ভালোই হত।"

ইতিমধ্যে পাটিসাপটা এসে গেছে। তাতে আমরা মনসংযোগ করলাম।

আমাদের রান্নাঘরটা বসার ঘরের লাগোয়া। মায়ের কানে সবকিছুই যাচ্ছিল। আমাদের খাওয়ার মাঝখানেই মা বললেন, "একটা লোক যদি অকারণে জেলে গিয়ে পুরো জীবনটা কাটায়, তার জীবন তো যায়ই, তার বৌ-বাচ্চার জীবনও ধ্বংস হয়। ওর ফ্যামিলির কথা কিছু জানো বিনয়?"

বিনয় ছোটোমামার নাম। ছোটোমামা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "স্ত্রী ছিল। প্রথম কয়েক মাস বছর তিনেকের একটা ছেলেকে নিয়ে আসত ওকে দেখতে। তারপর আর আসতে দেখিনি। পরে শুনেছি গজলই ওকে গুজরাতে বাপের বাড়ি চলে যেতে বলেছিল।"

আমরা সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেলাম। বুঝলাম ছোটোমামা আর মায়ের ব্যথাটা কোথায়।

ক্রিসমাসের সময়ে আমার কয়েকদিনের ছুটি। ছুটির ঠিক দু'দিন আগে একেনবাবু ফোন করে বললেন, "আমি আর প্রমথবাবু দিন তিনেকের জন্যে কৈগাছি যাচ্ছি স্যার, আপনি আসবেন?"

এটা এত অপ্রত্যাশিত যে, আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

"কৈগাছি যাচ্ছেন মানে!"

"কী করব স্যার, আপনার বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রমথবাবু আমাকে যাচ্ছেতাই বকলেন। মাসিমার অনারে অন্তত আমার কেসটা নেওয়া উচিত ছিল।"

"কীসের কেস!"

“কেন স্যার গজলালের?”

“এটা আবার কী কেস, এর সাজা তো অলরেডি হয়ে গেছে! খুনিও ডেড।”

“কী যে বলেন স্যার, সাজা তো হয় শুধু সত্যের দরবারে।”

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এই পুরো ব্যাপারটার পেছনে প্রমথ রয়েছে।

আমরা প্ল্যান করেছিলাম পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে যাব। প্রমথর উপর ভার ছিল থাকবার জন্য ওর মাসির বাড়িটা ম্যানেজ করা। নিশ্চয়ই সেটা করতে পারেনি। এখন আমাদের ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছে কৈগাছিতে।

আমি বললাম, “প্রমথকে ফোনটা দিন।”

“প্রমথবাবুকে?”

“হ্যাঁ, ও নিশ্চয়ই আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আপনিই শুধু গোয়েন্দা নাকি? ছলচাতুরি আমি কিছু বুঝি না!”

“দিচ্ছি স্যার।”

প্রমথ ফোনটা তুলেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে বলল, “তুই কৈগাছি যেতে না চাস যাবি না। আমাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে, আমরা যাচ্ছি।”

“দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আমাকে তুই জ্ঞান দিস না। মাসির শান্তিনিকেতনের বাড়িটা ম্যানেজ করেছিস?”

“না, তার কারণ আমরা কৈগাছি যাচ্ছি। তোর ইচ্ছে হয় তো শান্তিনিকেতনে যা।”

“থাকব কোথায়?”

“দ্যাটস ইওর প্রবলেম।”

২. যশোর রোড ধরে

কৈগাছি কোলকাতা থেকে মাত্র বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে- যশোর রোড ধরে যেতে হয়। তবে রাস্তা তেমন ভালো নয় আর ট্র্যাফিকও ভীষণ, সুতরাং সময় লাগে অনেকটা। আমারা থাকব ছায়ানীড়-এ। ওটা একটা গেস্ট হাউস কমবয়সি এক দম্পতি চালায়। একেনবাবু ওঁর পুলিশি সূত্র কাজে লাগিয়ে জায়গাটি আবিষ্কার করেছেন। কৈগাছিতে থ্রি-স্টার হোটেল আশা করা যায় না। তবে জায়গাটা নাকি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর ভাড়াও খুব রিজনেবল। ভাড়া যে আনরিজনেবল নয়, সেটা আমাকে না বললেও বুঝতাম। একেনবাবুর মতো হাড়কেপ্পন লোক হিসেবপত্তর না করে জায়গাটা বুক করতেন না। তাছাড়া কৈগাছি টুরিস্ট স্পট নয়। ডিসেম্বরের শেষের দিকটা হল বেড়ানোর মোক্ষম সময়। এই সময়ে কৈগাছিতে ছুটি কাটাতে কে আসবে! এগুলো বলছি বটে, কিন্তু কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়ার একটা আনন্দ আছে। যশোর রোডে যখন পড়লাম, তখন অজস্র ট্রাক, সাইকেল রিক্সা, গাড়ি, বাস ইত্যাদির দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও মনে বেশ ফুর্তিই এল।

আমি গাড়ি চালাচ্ছি, পাশে প্রমথ –আমার ন্যাভিগেটর। একেনবাবু পেছনে।

আমি বললাম, “বেশ লাগছে, না রে?”

প্রমথ তার উত্তর না দিয়ে বলল, “ঐ যাঃ, মশারিটা প্যাক করতে ভুলে গেছি।”

প্রমথ মশার কামড় সহ্য করতে পারে না। আর মশারাও প্রমথকেই টার্গেট করে। কোথাও মশা থাকলে আমাদের থেকে প্রমথই কামড় খায় বেশি।

“গেস্ট হাউসে নিশ্চয় মশারি থাকবে।” আমি ভরসা দিলাম।

“তোর মুণ্ডু।”

“তাহলে কোনো দোকান থেকে একটা কিনে নিস।”

“তুই পয়সা দিবি?”

"আমি কেন দেব? সমস্যাটা তো তোর!"

প্রমথ চটল, তাই অন্য লাইন ধরল। "বেশ আমিই কিনব, কিন্তু তুই দোকান খুঁজে বের করবি।"

"আমি মশারির দোকান কোথায় পাব!"

"তাহলে বললি কেন-দোকান থেকে কিনে নিস। সব সময়ে বড় বড় কথা।"

আমাদের তর্কাতর্কি বন্ধ করার জন্যে একেনবাবু বললেন, "যাই বলুন স্যার, কলকাতার বাইরে এলেই মনটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যায়।"

"গুড, তা বলে গান ধরবেন না, বাপি গাড়ি চালাচ্ছে। এমনিতেই ও আনস্টেডি।"

"জানলে তো ধরব স্যার, গান আমার আসেই না।"

"বাঁচিয়েছেন। আপনার ঐ ঘ্যানঘ্যানে গলায় গান এলে, সত্যিই একটা সমস্যা হতো।"

প্রমথ অকারণে মানুষকে আঘাত করে। আমি প্রমথকে বললাম, "তোর বাজে কথা বলাটা একটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।"

"কোনটা বাজে কথা?"

"এই একেনবাবুর গান নিয়ে।"

"বাজেটা কী বললাম, গলায় সুর থাকলেই তো শুধু হয় না, সেটা শ্রুতিমধুর করার জন্য গলার একটা ক্যারেক্টার চাই। সেটা একেনবাবুর নেই।"

"তোর ওপিনিয়ন আমরা কেউ শুনতে চাই না।"

"না চাইলে শুনিস না। তোর মতো গা বাঁচিয়ে আমি চলি না।"

"তোর সঙ্গে তর্ক করা অর্থহীন।" আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

"গুড, তোর একটু লেট-এ বোঝা স্বভাব।"

সারাটা পথ এইরকম হাবিজাবি অবান্তর কথা চালাচালি করেই কাটল। পাক্কা আড়াই ঘন্টা লেগে গেল ছায়ানীড়ে পৌঁছতে। কুড়ি মিনিট অবশ্য একস্ট্রা লাগল জায়গাটা খুঁজে পেতে। বাড়িটা বড় রাস্তার ওপর নয়। একটা ছোটো মেঠো রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা যেতে হয়। খান ছয়েক কুঁড়েঘর পার হয়ে, রাস্তার ওপর বসা ছাগল, মুরগির পালকে ক্রমাগত হর্ন দিতে দিতে সরিয়ে রাস্তাটা যেখানে ডান দিকে মোড় নিয়েছে সেখানে পৌঁছনোর পর বাড়িটা চোখে পড়ে। বড় রাস্তায় অবশ্য ছায়ানীড় এইদিকে বলে একটা ছোটো সাইন বোর্ড আছে, কিন্তু সেটা প্রথমবার মিস করেছিলাম।

বাড়িটা নতুন রঙ করা –ছিমছাম সুন্দর। মালিক সুবীর দাস আমাদের জন্য বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদেরই বয়সি-হয়তো বা একটু ছোটোই;

বেঁটেখাটো গোলগাল ফর্সা চেহারা। বয়সের তুলনায় মনে হল একটু বেশি সিরিয়াস। ঘরে ঢুকতেই "আসুন আসুন, বসুন," বলে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর চেঁচিয়ে একজনকে ডেকে বললেন, "একটু চা কর, ওঁরা এসে গেছেন।"

যাঁকে ডাকলেন তিনিও এক ঝলকের জন্য দেখা দিলেন। শ্যামলা রঙ, বড় বড় চোখ, কোঁকড়ানো চুল টেনে খোঁপা করে বাঁধা, মিষ্টি চেহারা। সুবীরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, "আমার স্ত্রী অঞ্জনা।"

আমরা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম।

অঞ্জনা বেশ সপ্রতিভ। বললেন, "চায়ের সঙ্গে একটু টা-ও দিচ্ছি, দুপুরের খাবার কিন্তু একটার আগে পাওয়া যাবে না।"

আমি একটু ভদ্রতা করলাম, "শুধু চা হলেই চলবে।"

প্রমথ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ওর কথা শুনবেন না, আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন।"

অঞ্জনা মুখ টিপে হেসে ভেতরে চলে গেলেন।

সুবীরবাবু আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা মনে হচ্ছে বেশ ভালোই বন্ধু।"

“একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে, প্রমথ বলল। “সেই থেকে ওকে সামলাতে হচ্ছে। তবে ইনি আমাদের নতুন বন্ধু –বিখ্যাত গোয়েন্দা একেন্দ্র সেন।”

“কী যে বলেন স্যার,” একেনবাবু একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন।

“কেন বলব না –লোককে তো জানাতে হবে, বাপির কলমের জোরে আপনার পরিচিতি হবে ভেবে থাকলে পস্তাবেন।”

আমি প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যেই বললাম, “আমাদের ঘরগুলো কোথায়?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন,” বলে সুবীরবাবু আমাদের নিয়ে বাইরে এলেন। বাড়ির পাশ দিয়ে সিমেন্ট-বাঁধানো সরু প্যাসেজ পেছনের দিকে চলে গেছে। একটু এগোলেই পাশাপাশি তিনটে ঘর। ঘরে ঢোকার জন্য আলাদা আলাদা দরজা। পাশে একটা করে ছোটো জানলা। সবগুলোই বন্ধ। প্যাসেজের উলটো দিকে মাঝারি সাইজের ফুলের বাগান। একেনবাবু সেটা দেখে মুগ্ধ।

“গ্র্যান্ড বাগান স্যার আপনার! সত্যি কোলকাতায় এসব ভাবা যায় না....এত বড় সাইজের ডালিয়া আমি বহুদিন দেখিনি।”

সুবীরবাবু খুশি হলেন বাগানের প্রশংসায়। “এবারের ডালিয়া বেশ ভালো হয়েছে। তবে এর থেকে আরও অনেক বড় ডালিয়া দেখবেন প্রশান্তদার বাগানে।”

“উনি কি কাছাকাছি থাকেন?”

“খুবই কাছে, সামনের রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে।”

“সেটা তো দেখতে হচ্ছে স্যার।”

.

আমার আর প্রমথর কারোরই ফুলের ব্যাপারে উৎসাহ নেই। প্রমথ বলল, “তার আগে আমাদের ঘরগুলোর ভেতরটা দেখি।”

"ও হ্যাঁ," বলে সুবীরবাবু একটা দরজা খুললেন। "সবগুলো ঘরই এক রকম।"

ঘরটা বন্ধ ছিল বলে একটু ভ্যাপসা গন্ধ। সেটা অবশ্য একটু বাদেই চলে গেল। এমনিতে ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফার্নিচার বলতে একটা ডাবল বেড, মাথার পাশে দুটো নাইট স্ট্যান্ড, দুটো চেয়ার। এক দিকের দেয়ালে জামাকাপড় রাখার জন্য একটা ক্লজেট। তার পাশেই আয়না লাগানো নীচু ড্রেসিং টেবিল।

"প্রত্যেকটা ঘরেই অ্যাটাচড বাথরুম," একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন সুধীরবাবু। "ওগুলোকে মর্ডান স্টাইলে করেছি বিদেশি বা আপনাদের মতো গেস্টদের জন্য।"

বাথরুমটা একটু উঁকি দিয়ে দেখলাম। কমোডটা দেশি বা ওয়েস্টার্ন স্টাইল কোনোটাই নয়, আবার দুটোই। অর্থাৎ, দেশি স্টাইলেও হাঁটুমুড়ে বসা যায় আবার চেয়ারের মতো করেও যায়। কী জানি স্পেশাল নাম আছে এগুলোর, ঠিক মনে পড়ল না।

টয়লেট টিস্যু অবশ্য দেখলাম না, শুধু জলের কল আর মগ। গিজার লাগানো শাওয়ার আছে, সেই সঙ্গে বালতিও।

শাওয়ার খুললে পুরো বাথরুমটাই ভিজে যাবে। বিদেশি পর্যটকদের সেটা পছন্দ হবে না, তবে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।

সুবীরবাবু এতক্ষণ আমাদের রি-অ্যাকশন দেখছিলেন। দেখা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের পছন্দ হয়েছে?"

প্রমথকে সন্তুষ্ট করা শক্ত। পাছে ও একটা বাঁকা মন্তব্য করে বসে তাই আমি বললাম, "বেশ ভালোই তো।"

একেনবাবু সেটাকে আরেক ধাপ চড়িয়ে বললেন, "ভাবাই যায় না স্যার, এত সুন্দর বন্দোবস্ত। বিদেশি গেস্ট বললেন, সাহেবরাও এখানে আসেন নাকি স্যার?"

“লোক-উৎসব দেখতে গত বছর দু’জন সাহেব এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। ওঁরাও বাথরুমের অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে খুশি হয়েছিলেন।”

“না হবার তো কোনো কারণ নেই স্যার।”

ব্যাগগুলো নিজেদের ঘরে রেখে সবাই বাইরের ঘরে এসে বসলাম। সুবীরবাবু বললেন, “যখন খুশি এখানে এসে বসবেন –এটা মন বসার ঘর। সকালের খাবারটা এখানেই খাওয়া হয়। পাশে খাবার ঘর –লাঞ্চ আর ডিনার সেখানে হয়। সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট, একটায় লাঞ্চ আর রাত আটটায় ডিনার। আপনারা তো নন-ভেজ, তাই না? আগেই অবশ্য আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।”

“ভেজ, নন-ভেজ কিছু একটা হলেই চলবে।” আমি বললাম, “কিন্তু আপনার স্ত্রী আবার এই দশটার সময় কষ্ট করে রান্না করছেন –ব্রেকফাস্টের সময় তো অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে।”

“আরে তাতে কী হয়েছে, সময়টা কিছু বাঁধাধরা নয়। সময়ের অত হিসেব করলে কি চলে?”

প্রমথ এতক্ষণ টেবিলের ওপর রাখা একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে চোখ বোলাচ্ছিল। পত্রিকাটা নামিয়ে বলল, “আমরা দু’দিন থাকব, সেটা তো আপনাকে আগেই জানানো হয়েছে, কিন্তু যদি সেটা এক্সটেন্ড করতে হয়, পারা যাবে?”

“নিশ্চয়ই। আগামী সপ্তাহে বুকিং আছে, এ সপ্তাহটা এখন পর্যন্ত ফাঁকা।”

“গুড।”

“এক্সটেন্ড করার কথা কেন ভাবছিস?” আমি একটু অবাক হয়ে প্রমথকে জিজ্ঞেস করলাম।

“কারণ রান্নার সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি।”

প্রমথর রসিকতাটা সুবীরবাবু বোধহয় ঠিক ধরতে পারলেন না। রেজিস্ট্রি বইয়ের পাতা উল্টে বললেন, “নেক্সট উইকের মঙ্গলবার পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে এখানে কাটাতে পারেন।”

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “এ দু’দিন কোথাও বেড়াতে যেতে চান আপনারা?”

“কিছু দেখার আছে এখানে?” প্রমথ উলটে প্রশ্ন করল। “তেমন কিছু নেই। একটা ভাঙ্গা প্রাসাদ আছে –রাজা জগদীশনারায়ণের। এখন ওটা একটা পোড়ো বাড়ি –সমাজ বিরোধীদের জায়গা। দিনদুপুরে অবশ্য কোনো ভয় নেই। প্রাসাদের পেছনের বাগানটা এখনও আছে, একটা ট্রাস্ট দেখভাল করে। এই সময়টাতে অনেক ফুলের গাছ দেখবেন। ক’দিন বাদে এলে কাছেই একটা লোক-উৎসব হয়, সেখানে যেতে পারতেন। বেশ বড় মেলা বহু লোক আসে। তখন আশেপাশে কোথাও থাকার জায়গা পাওয়া কঠিন।”

“অন্য সময়ে আপনার গেস্টরা স্যার কারা?” একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

বার বার ‘স্যার’ শুনে সুধীরবাবু যে অসোয়াস্তি বোধ করছেন, সেটা বুঝছিলাম। এবার উনি বলেই ফেললেন, “আমাকে ‘স্যার, স্যার’ বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন।”

“ঐ লজ্জাটা আপনাকে কয়েক দিন পেতে হবে, প্রমথ গম্ভীর মুখে বলল, “একেনবাবু আমাদেরও ‘স্যার’ বলেন। ও নিয়ে না ভেবে উত্তরটা দিন –এখানে সাধারণত কারা থাকেন?”

“কাছাকাছি কয়েকটা কারখানা হয়েছে, তাদের ভেন্ডার সাপ্লায়েররা কেউ কেউ আসেন। এছাড়া আশেপাশে বেশ কিছু কনস্ট্রাকশন চলছে। কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়াররা মাঝে মাঝেই দু-এক মাসের জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে নেন। কেউ কেউ আবার নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্যেও আসেন-যেমন আপনারা এসেছেন।”

“আমরা কিন্তু স্যার নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্যে ঠিক আসিনি।”

“তাহলে কীসের জন্যে এসেছেন?” সুবীরবাবুর চোখে কৌতূহল।

.

এমন সময় অঞ্জনা একটি কাজের মেয়েকে নিয়ে চা, পরোটা আর আলুর তরকারি নিয়ে ঢুকলেন। সুন্দর গন্ধে ঘরটা আমোদিত হয়ে উঠলো।

“চায়ে চিনি বা দুধ দিইনি, আপনারা পছন্দ মতো মিশিয়ে নিন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।” বলে প্রমথ একটা প্লেট তুলে নিয়ে আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে অঞ্জনাকে বলল, “আমার মনে হয় না, বাপি খাবে বলে। ওরটাও আমি খাচ্ছি।”

“আরও অনেক পরোটা আর তরকারি আছে,” অঞ্জনা হেসে প্রমথকে অভয় দিয়ে সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমাকেও দেব?”

“আরে না, আমি তো একটু আগেই খেলাম।”

আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বললাম, “আমরা একলা একলা খাব?”

উত্তরটা ওঁদের আগে প্রমথই দিল, “খাস না। তোকে তো কেউ খেতে সাধছে না।”

এবার অঞ্জনাও বললেন, “আপনারা সত্যিই ভীষণ বন্ধু –এরকম আজকাল বেশি দেখি না।”

আমরা খাওয়া শুরু করতে সুবীরবাবু বললেন, “আপনারা বেড়াতে আসেননি বললেন, তাহলে কীসের জন্য এসেছেন?”

“আসলে স্যার এখানে বহুদিন আগে একটা মার্ডার হয়েছিল, সেটা নিয়ে একটু খোঁজখবর করতে।“

কথাটা শোনামাত্র সুবীরবাবু আর অঞ্জনা চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। আমাদের কারোরই সেটা নজর এড়ালো না। প্রমথ বলল, “একেনবাবু নিউ ইয়র্কের একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, আপাতত কলকাতায় আছেন। একজনের অনুরোধে ওটা নিয়ে খোঁজখবর নিতে এসেছেন।”

সুবীরবাবু গলায় একটু উত্তেজনার আভাস পেলাম, “কতদিন আগের কথা বলছেন?”

“তা প্রায় বাইশ বছর আগের ঘটনা।”

“কিন্তু সেই খুনের জন্যে তো একজনের জেল হয়েছিল। ক’দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম সে মারাও গেছে।”

“ঠিকই দেখছেন স্যার।”

"তাহলে?"

"তার উত্তরটা তো স্যার এখনও জানি না। প্রশ্নটা শুধু জানি।"

"কী প্রশ্ন?"

"যে খুনি বলে শাস্তি পেয়েছে, সেই আসল খুনি কি না।"

সুবীরবাবু অঞ্জনার দিকে তাকালেন।

অঞ্জনা বললেন, "বেশ কয়েক বছর আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একই কারণে এসেছিলেন, আমার বাবার সঙ্গে অনেক কথাও হয়েছিল তাঁর।"

"ভদ্রলোকের নাম কি বিনয়বাবু?"

"হ্যাঁ, ঐ রকমই একটা নাম বলেছিলেন। আপনি তাঁকে চেনেন?"

প্রমথ আমাকে দেখিয়ে বলল, "তিনি এঁর মামা।"

তাতে অবশ্য অঞ্জনা বা সুবীরবাবুর বিস্ময় কাটল না।

একেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, আপনারা কী ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানেন, বা এমন কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন যাঁর সেই সময়কার কথা মনে আছে?"

"সেটাই মুশকিল,"সুবীরবাবু বললেন। "যাঁরা জানতেন, অর্থাৎ অঞ্জনার বাবা আর আমার বাবা-তাঁদের কেউ বেঁচে নেই।"

"অঞ্জনা অনুচ্চস্বরে বলল, ওর বাবাও খুন হন সেই সময়ে –রাজা জগদীশনারায়ণের সঙ্গে।"

অঞ্জনার শেষ কথাটা আমরা কেউই এক্সপেক্ট করিনি।

"মাই গড! সুরেশ মিত্র আপনার বাবা স্যার?" একেনবাবু সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন।

সুবীরবাবু এই প্রশ্নে ক্ষণিকের জন্য একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ।"

"আমি একটু কনফিউজড স্যার। আপনার পদবী তো দাশ, উনি তো ছিলেন মিত্র?"

"উনি যখন মারা যান, আমি তখন ছোটো। মা তারপর আরেক জনকে বিয়ে করেন, তাঁর পদবীই আমি ব্যবহার করি।"

অঞ্জনা বললেন, "আমার বাবার সঙ্গে সুবীরের দুই বাবারও খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু একটা কথা বলুন তো, এতদিন বাদে আপনাদের কেন মনে হচ্ছে যে আসল খুনি ধরা পড়েনি?"

"হয়তো ধরা পড়েছে ম্যাডাম। ওই যে বিনয়বাবুর কথা বললেন, তাঁর মানে একটা খটকা ছিল। আর আমাদেরও হাতে কোনো কাজকর্ম নেই, তাই ভাবলাম বেড়ানোও হবে আর রহস্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও হবে।"

অঞ্জনা বলল, "আমি ডিটেকটিভ গল্প ভীষণ ভালোবাসি, আমি আপনাদের যা সাহায্যের দরকার করতে পারি। কিন্তু একটা কন্ডিশনে- কী করে রহস্যভেদ করলেন জানাতে হবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ, নিশ্চয়ই জানাব।"

"সবই বুঝলাম, তবে লাঞ্চ না হওয়া পর্যন্ত আপনি এদিকে কোনো অ্যাটেনশন দেবেন না।" প্রমথ সতর্ক করল।

"না, দেব না," অঞ্জনা বুদ্ধিমতী– প্রমথকে ইতিমধ্যেই চিনে নিয়েছেন। "লাঞ্চের আইটেম মোটেও কম হবে না।"

৩. জগদীশনারায়ণের কেস ফাইলগুলো

যেটা আমি জানতাম না সেটা হল, ছোটোমামা যখন জগদীশনারায়ণের কেস ফাইলগুলো দেখেছিলেন, তার বহু তথ্যই উনি একটা ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলেন। একেনবাবু এর মধ্যেই সেটা হস্তগত করেছেন। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না, তার কারণ প্রমথ আর একেনবাবু দু'জনেরই ভয় ছিল,

পৌষমেলায় না গিয়ে আমরা এখানে আসছি জানলে আমি কুরুক্ষেত্র বাঁধাব। তাই শেষ সময়ে আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই সমস্ত কেসটাতেই আমি একটা ডিস-অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে। একেনবাবু অনেক কিছুই জানেন, প্রমথও বেশ কিছু জানে, আমার জ্ঞান শূন্য। দুপুরে খেতে বসার আগে একেনবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি যা উদ্ধার করলাম, তার সংক্ষিপ্তসার হল:

রাজা জগদীশনারায়ণ যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স প্রায় আশি। তিনি বিপত্নীক ছিলেন –ছেলেপুলেও ছিল না। পূর্ববঙ্গে ওঁর বিরাট জমিদারি ছিল, কিন্তু তার বেশির ভাগই দেশ বিভাগের সময় খোয়ান। এদেশের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে জমি-বাড়ি এক্সচেঞ্জ করে কিছু ক্যাশ টাকা পেয়েছিলেন; আর মৃত স্ত্রীর কিছু গয়নাগাটি –এই ছিল ওঁর সম্বল। সেই ক্যাশ টাকা আর সম্ভবত কিছু গয়নাগাটি বেচে বিশাল বাড়িটা করান। কেন? তার কোনো সদুত্তর নেই। তবে ওঁর মেজাজটা রাজার মতোই ছিল। তাই সব কিছু খুইয়েও প্রাসাদে থাকার অভ্যাসটা বোধহয় ছাড়তে পারেননি।

ওঁর কাজের লোক বলতে ছিল চারজন –একজন রান্না করত, আরেকজন ফাইফরমাশ খাটত। আর ছিল একটি ঠিকে ঝি, আর এক পার্ট-টাইম মালী। নিজে প্রাসাদের এক কোণে থাকতেন।

নিজের শোবার ঘরটা বাদ দিলে খাবার ঘর, বসার ঘর আর একটা অফিসঘর ছাড়া বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলো বন্ধ অবস্থাতেই থাকত। পেছনের বাগানের লাগোয়া একটা ছোটো সার্ভেন্টস কোয়ার্টার বানিয়েছিলেন, কিন্তু কাজের লোকেরা কেউই সেখানে থাকত না। রাজা জগদীশনারায়ণ একলা শুতে ভয় পেতেন বলে তাদের দুজন জগদীশনারায়ণের শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় ঘুমাত।

সিঁড়ির নীচে একটা খুপরিতে ওদের জিনিসপত্র থাকত। জগদীশনারায়ণের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ রক্ষা করতেন ওঁর এক সেক্রেটারি-কাম বাজার সরকার। এই ভদ্রলোকই সুরেশ মিত্র, যিনি সুবীরবাবুর নিজের বাবা।

জিনিসপত্র কেনাকাটা করা, কাজের লোকদের মাইনেপত্র দেওয়া, যেটুকু জমিজমা আছে সেটা সামলানো, টাকাপয়সার হিসেব রাখা –সংসারের প্রায় যাবতীয় কাজকর্ম সুরেশবাবুই করতেন। ১৯৫৫ সালে জগদীশনারায়ণ যখন ওঁর বাড়িটা তৈরি করাচ্ছিলেন তখন সুরেশবাবুর বাবা ছিলেন বিল্ডিং কনট্রাক্টরের সাইট সুপারভাইজার। বাড়িটা শেষ হয়ে গেলে জগদীশনারায়ণ সুরেশবাবুর বাবাকে ওঁর সেক্রেটারির কাজ অফার করেন। বছর কুড়ি চাকরি করার পর যখন সুরেশবাবুর বাবার মৃত্যু হয়, তখন সুরেশবাবুকে কাজে বহাল করেন। সুরেশবাবু সেই সময়ে বি.এ. পাশ করে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছিলেন। স্কুলের পাকা চাকরি না ছেড়েই একস্ট্রা টাকার জন্যে এই কাজটা নেন। জগদীশনারায়ণ ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কে টাকা রাখায় বিশ্বাস করতেন না। কারণ ওঁর কোনো অ্যাকাউন্টের খবর পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। পোস্ট অফিসে হাজার দশেক টাকা ছিল। পোস্ট অফিসের পাশ বই আর কিছু কোম্পানির কাগজ পুলিশ ওঁর অফিসঘরের সিন্দুকে পায়। কাগজগুলোর মূল্যও বিরাট কিছু নয় বড়জোর হাজার তিরিশেক হবে। এছাড়া সিন্দুকে আর কিছুই ছিল না-না গয়না, না ক্যাশ টাকা। টাকাকড়ি নিয়ে জগদীশনারায়ণ চিন্তিত ছিলেন এবং এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে সুরেশবাবুর আলোচনার কথা বাড়ির কাজের লোকদের জেরা করে পুলিশ জেনেছিল। এও জেনেছিল যে, জগদীশনারায়ণ ওঁর পুরোনো কিছু মোহর আর একটা হিরে বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন। ওটা বিক্রি করলে সব সমস্যা মিটে যাবে-ওঁদের কথাবার্তা শুনে এটাই কাজের লোকদের মনে হয়েছিল। এই নিয়ে অশোকনগরের এক গুজরাতি ব্যবসায়ী গজলাল প্যাটেলের সঙ্গে সুরেশবাবুর কথা হয়েছিল। গজলাল জগদীশনারায়ণের সঙ্গেও কথা বলে যান।

এর ঠিক কয়েকদিন বাদে, দিনটা স্মরণীয় দিন, ১৫ই অগাস্ট, তিনজন মুখে রুমাল বাঁধা লোক দুপুরবেলা যখন জগদীশনারায়ণ খেতে বসেছেন তখন বাড়িতে ঢুকে ওঁকে গুলি করে। কাজের লোকদুটো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে পেয়ে চম্পট দেয়। বহু দূরে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে পরে সাহসভরে

সুরেশবাবুর স্কুলে যায় ওঁকে ঘটনাটা জানাতে। কিন্তু স্কুল তো বন্ধ। স্কুলের পাশে একটা বাড়িতে অন্য এক মাস্টারমশাই থাকতেন। তাঁকে ব্যাপারটা জানায়।

পুলিশ এসে সুরেশবাবুকে না পেয়ে, প্রথমে সন্দেহ করেছিল সুরেশবাবু এর মধ্যে জড়িত। ইতিমধ্যে একটা খবর আসে যে, গজলাল বলে একটি লোক মুম্বাইয়ের এক হিরের ব্যবসায়ীকে বারো লাখ টাকায় একটা হিরে বিক্রি করার চেষ্টা করছে। তখন পুলিশ গজলালকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। গজলালের বক্তব্য সে ওই হিরে আর কয়েকটা আকবরি মোহর দশ লাখ টাকা ক্যাশ দিয়ে জগদীশনারায়ণের কাছ থেকে কিনেছে। নিজে গিয়ে সুরেশবাবু আর জগদীশনারায়ণকে টাকাটা দিয়ে এসেছে। গজলালের কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সুরেশবাবুর দোষী হবার সম্ভাবনাটা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। উনিই নিশ্চয়ই টাকাটা হস্তগত করে জগদীশনারায়ণকে খুন করিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টও বেরিয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে গ্রামের কয়েকজন লোক জগদীশনারায়ণের বাগান থেকে ফুল তুলতে গিয়ে বিশ্রী পচা গন্ধ পায়-যেটা আসছে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। তারা দরজার তালা ভেঙ্গে আবিষ্কার করে মুখ-বাঁধা অবস্থায় পিছমোড়া করে হাত-পা বাঁধা সুরেশবাবুর পচা-গলা মৃতদেহ। এবার সন্দেহটা আবার গিয়ে পড়ে গজলালের উপরে। সুরেশবাবুর মৃতদেহটা সরানোর পর পুলিশের চোখে পড়ে পেছনের দেয়ালে নখের আঁচড়ে করা কিছু সাংকেতিক দাগ। সেখান থেকেই পুলিশ নিঃসন্দেহ হয় যে, গজলই খুনি।। কী ধরণের সাংকেতিক দাগ সেটা আর শোনা হল না, তার আগেই লাঞ্চের ডাক পড়ল।

৪. আমার একটা দুর্বলতা

খাওয়া নিয়ে আমার একটা দুর্বলতা আছে। ফলাও করে সেটা বলি। এবার কিন্তু নিজেকে সংযত করছি। খেতে খেতে যে আলোচনাটা হল সেটাই বলি।

সুরেশবাবুর স্মৃতি সুবীরবাবুর কাছে এখন অস্পষ্ট। এটুকু ওঁর মনে আছে বাবা একদিন স্কুলে পড়াতে গিয়ে আর ফেরেননি। মা খুব কান্নাকাটি করছিলেন। আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ ছিল না, যাঁরা ছিলেন তাঁরাও খুব গরীব। মা একেবারে অথই জলে পড়লেন। তখন সুরেশবাবুর দুই বন্ধু অজয়কাকা আর কনককাকা এগিয়ে এলেন। কনককাকার মেয়েই হল অঞ্জনা। অজয়কাকা বিয়ে করেননি। তিনিই সংসারের হাল ধরলেন। পরে অজয়কাকাকেই মা বিয়ে করেন।

সুবীরকে তিনি অ্যাডপ্ট করেন-সুবীরের পদবী মিত্র থেকে দাস হয়। অঞ্জনা সুবীরের থেকে বছর তিনেকের ছোটো। জগদীশনারায়ণ আর সুরেশবাবুর মৃত্যুর সময় ওঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর। সুতরাং এ ব্যাপারে ওঁর নিজস্ব কোনো স্মৃতি নেই, মা-বাবার কাছে। যেটুকু শুনেছেন। তবে অঞ্জনা বললেন, “কানাইকাকার কাছে কিছু খবর পাওয়া যাবে। ওঁর মেমারি খুব ভালো, উনি সুরেশকাকাকেও চিনতেন। তবে সন্ধ্যের আগে ওঁকে পাওয়া যাবে না। এখনও কলকাতায় নিয়মিত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন।”

“আর কে এ ব্যাপারে বলতে পারেন?”

“মা এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু মা’র আজকাল কিছু মনে থাকে না,” অঞ্জনা বলল।

“আপনার বাবা কী করতেন ম্যাডাম?”

“বাবার লরির ব্যবসা ছিল।”

আমি মনে মনে হিসেব করছিলাম, বেঁচে থাকলে অঞ্জনা বা সুবীরবাবুর বাবাদের বয়স কারোরই ষাটের বেশি হওয়ার কথা নয়। সুবীরবাবুর বয়স যদি তিরিশও ধরি, আর উনি যখন জন্মান তখন যদি ওঁর বাবার বয়স হয় তিরিশ, তাহলে এখন ষাট দাঁড়াত। যাই হোক পঞ্চান্ন বা ষাট পঁয়ষট্টি-কোনওটাই আজকের দিনে খুব একটা বেশি বয়স নয়।

“আপনারা কি খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু ঘুমিয়ে নিতে চান?”

ওঁরা নিজেরা বোধহয় ঘুমোন, তাই এই প্রশ্ন। আমাদের প্ল্যান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল-দুপুরে জগদীশনারায়ণের বাড়িটা দেখতে যাব। সেটা জানাতে সুবীরবাবু বলতেন,

"তাহলে ঠিক আছে, নইলে আপনাদের বিছানাটা রেখাকে এখনই করে দিতে বলতাম।"

রেখা নিশ্চয়ই ওদের কাজের মেয়েটির নাম।

"আপনাদের এখানে মশা কীরকম?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"এবার অত বেশি হয়নি। এমনিতে বিকেলের আগে দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখলে ঘরে ঢুকতে পারে না। তারপর রাত্রে জানলা খুলে দিন, তখন বাবাজিরা আর আসবে না। তবু মশারি ব্যবহার করবেন। রেখাই বিছানা করার সময়ে টাঙিয়ে দেবে।"

.

কথাটা শোনা মাত্র একেনবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রমথকে বললেন, "দেখুন স্যার, সমস্যার কেমন সমাধান হয়ে গেল।"

"কীসের সমস্যা?" সুবীরবাবু একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"আমরা স্যার আসার সময়ে আলোচনা করছিলাম, আপনার এখানে মশারি থাকবে কি না।"

"কেন থাকবে না, প্রত্যেকটা গেস্টরুমেই মশারি আছে।"

"আমার মশারির দরকার নেই," আমি বললাম। "আমি কোলকাতায় মশারি ছাড়াই শুই।"

"এখানে শোবেন না, এ অঞ্চলে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াটা একটু বেশি।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, অঞ্জনার বাবা ওতেই মারা গেলেন গত বছর। উনিও মশারির ধার ধারতেন না।"

একটা মৃত্যুর উত্তর জানা গেল। ভাবলাম সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করি, ওঁর পালক পিতার মৃত্যু কী করে হল। নিজেকে সংযত করলাম।

খেয়েদেয়ে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। সুবীরবাবু ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন। বড় রাস্তা ধরে আরও এক কিলোমিটার এগোলে একটা ছোটো কালভার্ট পাওয়া যাবে। তার ঠিক আগে যে রাস্তাটা বাঁ দিকে গেছে, সেটা দিয়ে আধকিলোমিটার গেলেই জগদীশনারায়ণের বাড়ি। মাত্র দেড় কিলোমিটার পথ। তাও গাড়ি নিয়েই গেলাম। সেখান থেকে আশেপাশে একটু ঘুরে বেড়ানো যাবে।

জগদীশনারায়ণের বাড়ি দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ। দেয়াল থেকে ইট খসে পড়েছে। কাঠের জানলার বেশির ভাগই অদৃশ্য হয়েছে। সামনের মাঠে অন্তত হাফ ডজন গরু চরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা লোক বারান্দায় বসে বিড়ি খাচ্ছে আর তাস খেলছে। আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে সবাই সচকিত। খাকি প্যান্ট পরা বুড়ো মতো একটা লোক উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কী চাই।

"পেছনের বাগানটা দেখাশোনা করে কে?" প্রমথ প্রশ্ন করল।

"আমি করি বাবু।"

"ওটা দেখব।"

"আপনারা?"

"আমরা অফিস থেকে আসছি।"

এত কনফিডেন্টলি প্রমথ কথাটা বলল, লোকটা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। বাড়ির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পেছনের ভাঙ্গা দরজা খুলে যেখানে নিয়ে এল-তার সামনেই একটা বিশাল পুকুর। সেই পুকুরের দুপাশে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু ফুলের বেড। গাছগুলো একটু দূরে দূরে বলে ফুলগাছগুলোতে আলোর অভাব হয় না, থোকা থোকা অজস্র ফুল ফুটে আছে। পুকুরের উলটো পারে একটা ভাঙ্গা ছোটো বাড়ি। সেটাই নিশ্চয়ই সার্ভেন্টস কোয়ার্টার যেখানে সুরেশবাবুর বডি পাওয়া গিয়েছিল।

আমরা পুকুরটা ডানদিকে রেখে বাগানের মধ্যে দিয়ে এগোলাম। হঠাৎ একেনবাবু বলে উঠলেন,

“অ্যামেজিং স্যার।”

“কী অ্যামেজিং?”

“এই গাছটা দেখুন একদিকের ফুলগুলো সব লাল, আর অন্যদিকে শুধু বেগুনি।”

সত্যিই ইন্টারেস্টিং! “দু’রকম রঙের ফুল একই গাছে দেখেছি,” আমি বললাম। “কিন্তু সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এরকম কখনও দেখিনি।”

প্রমথ বিজ্ঞের মতো বলল, “এটা এমন কী ব্যাপার –একটা গাছে অন্যরকমের গাছ। গ্র্যাফটিং করা হয়েছে।”

“তুই কী করে জানলি?”

“তোর অন্য কোনো এক্সপ্লানেশন আছে?”

সোজাভাবে উত্তর দেওয়া প্রমথর ধাতে নেই।

আমি আর প্রমথ সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে এগোচ্ছি দেখে বুড়ো লোকটা বলল, “ওদিকে যাবেন না বাবু, ওখানে অনেক সাপ আছে।”

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। হয়তো চোখের ভুল, কিন্তু মনে হল আমাদের একটু সামনেই সাপের মতো কিছু একটা কিলবিল করে চলে গেল। আমরা সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে

বড়জোর দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এই দিকটায় জঙ্গল সাফ করা হয় না। বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ভর্তি।

সার্ভেন্টস কোয়ার্টারটা দেখতে যাচ্ছিলাম নিতান্তই কৌতূহলবশে। এত বছর বাদে ওখানে কিছু আবিষ্কৃত হবে-সে আশা ছিল না। একেনবাবুর মনে হল সার্ভেন্টস কোয়ার্টার দেখার চেয়ে বাগান দেখতেই

উৎসাহ বেশি। এদিক যাচ্ছেন, ওদিক যাচ্ছেন-মাঝে মাঝে বুড়ো লোকটাকে গাছ নিয়ে প্রশ্ন করছেন। লোকটা গাছের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না, ওর কাজ বুঝলাম শুধু জায়গাটা পাহারা দেওয়া। সকালে আর বিকেলে দুটো মালী আসে। তখন দরকার মতো তাদের একটু আধটু সাহায্য করে।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর প্রমথ একেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "কী মশাই, আর কিছু দেখবেন?"

একেনবাবু একটু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "না স্যার, অনেক তো দেখা হল।"

আমরা গাড়ির দিকে যখন এগোচ্ছি, তখন বুড়ো লোকটা বলল, "স্যার, বড়বাবু কবে আসবেন?"

কে বড়বাবু আমাদের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু প্রমথ জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"গোবর সার ফুরিয়ে গেছে, মালীরা ক'দিন ধরে বলছে।"

"এটা আমাকে বলছ কেন, অফিসে গিয়ে খবর দিও।"

"হ্যাঁ, বাবু।"

গাড়িতে উঠে আমি প্রমথকে বললাম, "ভালোই ম্যানেজ করেছিস।"

"কাউকে তো করতে হবে-তোরা দু'জন তো মুখ বুজে বসেছিলি। এই যে গোয়েন্দামশাই, কিছু বুঝলেন?"

"কীসের কথা বলছেন স্যার?"

"কীসের কথা মানে? গোয়েন্দা তো আপনি! এত দূর ঠেঙিয়ে বাপির পেট্রল ধ্বংস করে –এটাই আপনার উত্তর?"

"আসলে স্যার, আমি একটু কনফিউজড।"

"কনফিউজড? কেন, একটা গাছে দু'রকমের ফুল দেখে?" প্রমথর গলায় ঠাট্টার সুর।

"সেটাও একটা কারণ স্যার। আমি বুড়ো দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করছিলাম। ও বলল, বহুদিন ধরে সবাই ভেবেছিল ওটা লালফুলের গাছ। হঠাৎ একদিন দেখে বেগুনি ফুলে গাছটা ভরে গেছে। ওরা

স্যার আপনার গ্র্যাফটিং-এর ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না। বলল, রাজাসাহেব বেগুনি ফুল ভালোবাসতেন, উনিই ওটা ফুটিয়েছেন।”

“ননসেন্স!” প্রমথ বলল। “দেশটা কুসংস্কারে ভর্তি!”

“প্রমথর কথা বাদ দিন, আপনার কনিফিউশানের অন্য কারণটা কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“আসলে স্যার, আমি ভাবছিলাম এই সুরেশবাবুকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটা। কেন গজলালের লোকরা সুরেশবাবুকে বেঁধে রাখল-খুন না করে?”

“এতে কনফিউজড হবার কী আছে? আমার কাছে তো ব্যাপারটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার,” প্রমথ বলল।

“কী ক্রিস্টাল ক্লিয়ার?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“গজলাল আর তার সাঙ্গপাঙ্গ পিস্তল উঁচিয়ে সুরেশবাবুর কাছে সিন্দুকের চাবি চায়। সুরেশবাবু ভয়ে পেয়ে ওদের চাবি দেন। কিন্তু সেটা ঠিক চাবি না ভুল চাবি-সেটা গজলালের জানার কোনো উপায় ছিল না। ওঁকে বেঁধে রেখে জগদীশনারায়ণকে খুন করে গজলাল আর ওর সঙ্গীরা সিন্দুক খোলে। সিন্দুকটা যদি না খুলত, তাহলে আসল চাবির জন্যে আবার সুরেশবাবুর উপর হামলা চালানো যেত, কিন্তু সুরেশবাবুকে খুন করলে, সেটা সম্ভব হতো না।”

“তা বুঝলাম স্যার, কিন্তু সুরেশবাবুকে যদি পুলিশ খুঁজে পেত, তাহলে তো গজল সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ত।”

“ওদের সবার মুখই ঢাকা ছিল, কাজের লোকদের কেউ গজলালকে চিনতে পারেনি। সুরেশবাবু কী করে শিওর হবেন।”

“দ্যাট দ্য পাজল স্যার। সুরেশবাবু গজলালকে চিনতে পেরেছিলেন আর সাংকেতিক ভাবে ওঁর নামটা লিখেছিলেন।”

“সাংকেতিক ভাবে কেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “আমার মনে হয় দুটো কারণে। সুরেশবাবুর হাত পেছনে বাঁধা ছিল।

ওই অবস্থায় অক্ষর লেখা খুবই কঠিন। একটা পাথর কুচি বা ধারালো কিছু কাছাকাছি পেয়েছিলেন, তাই দিয়ে দেয়ালে সংখ্যা লিখেছিলেন।”

“কী সংখ্যা?”

একেনবাবু পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো আমায় দিলেন। “এটা ফটো থেকে কপি করা।”

দেখলাম সেখানে লেখা আছে:

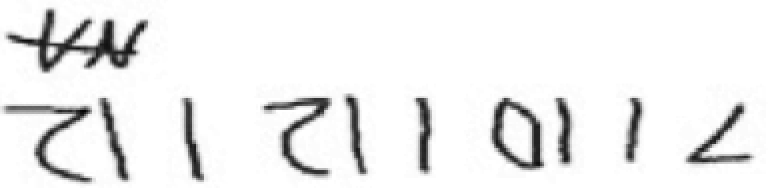

“এর অর্থ কী?”

“উনি পেছনে হাত দিয়ে সংখ্যাগুলো লিখেছিলেন বলে উলটো দেখাচ্ছে। এভাবে পড়ুন স্যার,”

একেনবাবু কাগজটা উলটো করে ধরলেন।

7 1 10 1 12 1 12

~~NA~~

“7 1 10 1 12 1 12 ……… তা তো বুঝলাম, কিন্তু অর্থটা কী?”

“এগুলো স্যার ইংরেজি ABCD র পজিশন। A হল ‘1’, B হল ‘2’, এইভাবে চললে G হল ‘7’, J হবে ‘10’, আর L হবে ‘12’। অর্থাৎ যেটা লিখেছেন, সেটা হবে GAJALAL।”

“মাই গড!”

“সাংকেতিক ভাবে লেখার আরেকটা কারণও হয়তো ছিল স্যার।”

“আর কী কারণ?” প্রমথ আর আমি দু’জনেই প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্নটা করলাম।

“যদি গজলাল ও তার গুণ্ডার দল ফিরে এসে ওকে খুন করে, তাহলে ওরা যাতে না বোঝে যে, উনি গজলের নাম দেয়ালে লিখে যাচ্ছেন।”

“দ্যাটস ক্লেভার অফ হিম।” প্রমথ বলল।

“তবে একটা জিনিস একটু আনক্লিয়ার।”

“কী সেটা?”

“এগুলোর শেষে উনি কী লিখতে চেয়েছিলেন?”

~~NA~~ বা ওইরকম কিছু একটা....কিন্তু সেটা কী?”

“আপনার কী মনে হয়, এর কোনো একটা অর্থ আছে?”

“সেটাই ভাবছি স্যার।”

প্রমথ লেখাটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় উনি NA লিখতে চেয়েছিলেন, A–এর পেটটা বেশি কাটা হয়ে গেছে।”

“কিন্তু তার অর্থ কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“NA মানে Numbered_Alphabet অর্থাৎ অ্যালফাবেটের নম্বর, প্রমথ বিজ্ঞের মতো বলল।

“পুলিশের জন্যে একটা ক্লু।”

“ননসেন্স। এটা কোনো কথা হয় নাকি!”

“তোর কোনো বেটার এক্সপ্লানেশন আছে?”

৫. কানাইবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং লোক

বিকেলবেলা অঞ্জনা আমাদের কানাইবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। কানাইবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং লোক। চাকরি করেন রেলওয়ের বুকিং অফিসে-সেটা পেট চালানোর জন্য করতে হয়। ওঁর শখ হল ইলেকট্রনিক্সের জিনিস সারানো।

টেলিভিশন সেট, টেপ রেকর্ডার, ভিসিআর –হেন জিনিস নেই যাতে উনি হাত লাগান না। এ অঞ্চলের প্রায় সবাই আসে ওঁর কাছে।

পয়সা রোজগারের থেকে নতুন নতুন সার্কিট আর ডিজিটাল লজিকের প্যাঁচ উদ্ধার করেই উনি আনন্দ বেশি পান। আর ভালোবাসেন গল্প করতে।

আমরা যখন ওঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কানাইবাবু একটা সার্কিট ডায়াগ্রামের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

অঞ্জনাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে সার্কিট ডায়াগ্রামটা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন,

"আয় মা, আয়। এঁরা কারা?"

অঞ্জনা পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা বললেন।

"ওরে বাবা, সে তো অনেকদিনের আগের ঘটনা।"

"সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা স্যার। ম্যাডাম বললেন, যদি কেউ সে সময়ের কথা কিছু বলতে পারেন, তাহলে আপনি।"

"কথাটা ভুল বলেনি। কনকদা, অজয়দা, সুরেশদা –সবাই আমাকে ভাইয়ের মতো দেখতেন। কিন্তু জগদীশনারায়ণের ব্যাপারে আমি আর কী বলব। পুরোটাই একটা পাজল।"

"সুরেশবাবুর কেউ শত্রু ছিলেন স্যার?"

"সুরেশদার শত্রু?" একটু ভাবার চেষ্টা করলেন, কানাইবাবু। "তেমন তো কাউকে মনে পড়ছে না। তবে এইসব জায়গায় যেটা সাধারণত হয় সেটা হল জমিজমা নিয়ে গণ্ডগোল। সেরকম একটা গণ্ডগোল চলছিল কয়েকজনের সঙ্গে।"

"কাদের সঙ্গে স্যার?"

"জগদীশনারায়ণের জমিজমা দেখাশুনা করতেন সুরেশদা। বেশিরভাগ জমিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বিঘা যা ছিল, সেগুলো চাষ করতে দিয়েছিলেন দু'জনকে। একজনকে ঘোষের পো বলেই সবাই চিনত, নাম বোধহয় কালীচরণ বা ওই ধরনের কিছু একটা। আরেকজন হল লালা লালা হালদার।" তারপর অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কানাইবাবু, "হ্যাঁরে, লালাকে কি তোর মনে আছে?"

"না," মাথা নাড়লেন অঞ্জনা।

"মনে না থাকারই কথা, তুই তো তখন খুব ছোটো। ও হ্যাঁ, যা বলেছিলাম, লালা ছিল বেশ বাজে ক্যারেক্টারের লোক। ওর বৌ জদগীশনারায়ণের বাড়িতে কাজ করত, সেইজন্যেই বোধহয় জমিটা পেয়েছিল। লালা বা ঘোষের পো- কেউই ফসলের কোনো ভাগ জগদীশনারায়ণকে দিচ্ছিল না। সেই নিয়ে সুরেশদার সঙ্গে ওদের খুব ঝামেলা হয়। ঘোষের পো-কে চেষ্টাচরিত্র করে সুরেশদা গ্রামছাড়া করতে পেরেছিল, কিন্তু লালাকে নয়। কোর্ট কাছারির ভয় দেখিয়েও লাভ হয়নি। উলটে সুরেশদাকে মারধরের হুমকি দিয়েছিল ব্যাটাচ্ছেলে। একবার তো জগদীশনারায়ণের বাড়িতেও কয়েকজনকে নিয়ে চড়াও হয়েছিল-জগদীশনারায়ণ নাকি ওর বৌকে কুপ্রস্তাব দিয়েছে। সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার। পরে অবশ্য একটা মিটমাট হয়েছিল।"

"কী রকম মিটমাট স্যার?"

“তা সঠিক করে বলতে পারব না। ব্যাপারটা নিয়ে সুরেশদা কিছু বলতে চাইতেন না। তবে জমির ঝামেলাটা মিটেছিল কারণ লালা তার বৌকে নিয়ে এখান থেকে চলে যায়। মনে হয় টাকাপয়সা দিয়ে কিছু একটা রফা করা হয়েছিল।”

“জগদীশনারায়ণ কি দুশ্চরিত্র ছিলেন স্যার?”

“বড়লোকদের ব্যাপার, সব খবর কি আর কানে আসে। তবে ওই ঘটনা ছাড়া আর তো কিছু শুনিনি। লালার বৌ চলে যাবার পর গ্রামেরই এক কমবয়সি বিধবাকে ওই কাজে বহাল করা হয়। অনেকে ভেবেছিল, আবার হয়তো কিছু ঘটবে, কিন্তু না। আসলে আগে যেটা বললাম, লালার ক্যারেক্টার ভালো ছিল না। পরে শুনেছি এরকম তোলাবাজি আগেও নাকি এক আধবার করেছিল।”

“এসব জেনেও সুরেশবাবু লালাবাবুকে কাজ দিয়েছিলেন স্যার!”

“হয়তো এগুলো জানতেন না। এ ধরনের ব্যাপার নিয়ে তো কেউ মুখ খোলে না। তবে লালা যে একটু গুণ্ডা টাইপের –সেটা অজানা থাকার কথা নয়।”

“জমিজমা ছাড়া সুরেশবাবুর সঙ্গে কি লালাবাবুর কোনো সমস্যা হয়েছিল স্যার?”

“তেমন তো কিছু শুনিনি।”

“লালাবাবু এদিকে আর আসেননি স্যার?”

“এসেছিল শুনেছি, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। যেটা জানি, সেটা হল গজলাল ধরা পড়ার কয়েকদিন পর কনকদা আর অজয়দার কাছে অনেক কান্নাকাটি করে গিয়েছিল। সুরেশদার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিল বলে ক্ষমা চেয়েছিল সবার কাছে। এমনকী জগদীশনারায়ণের ব্যাপারটাও যে ভুল বোঝাবুঝি-সেটাও স্বীকার করেছিল।”

“একটা কথা জিজ্ঞেস করি স্যার, সেই সময়ে রাজা জগদীশনারায়ণের আর সুরেশবাবুর মৃত্যু নিয়ে অন্য কোনো লোককে কি কেউ এখানে সন্দেহ করতো?”

"এই প্রশ্নটা আমি নিজেও অনেক করেছি। কিছুদিন আগে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই আপনাদেরই মতো আমার কাছে এসে একই প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁকে যা বলেছিলাম, আপনাদেরও তাই বলছি। হ্যাঁ, গজলালকে আমরা কেউই পছন্দ করতাম না। একটা ঝাঁকা মাথায় নিয়ে এখানে এসে পাঁচ বছরের মধ্যে যে লোকটা দুটো বড় দোকানের মালিক হয়ে লাখ লাখ টাকার কারবার করতে পারে, সে কখনওই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। শুনতাম একটা স্মাগলিং রিং–এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই ক্রিমিনালদের সঙ্গে তার দোস্তি থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সুরেশদাকে ওভাবে বেঁধে রেখে তিলে তিলে খুন করার কারণটা কী? গুলি করে ওঁকেও তো ফিনিশ করে দেওয়া যেত!"

"হয়তো ওঁকে খুন করার ইচ্ছে ছিল না স্যার।"

"হ্যাঁ, সেটাই পরে খবরের কাগজগুলোতে বেরিয়েছিল। ভয় দেখিয়ে জগদীশনারায়ণের হিরে আর সোনাগুলোকে হাতানোই ছিল গজলের লোকদের প্ল্যান। ওইদিন সুরেশদা থাকবেন না, বুড়ো জগদীশনারায়ণকে সহজেই ভয় দেখিয়ে কবজা করা যাবে –এই ভেবে লোকগুলো এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ ওদের কেউ নিশ্চয়ই দেখে সুরেশদা ওখানে আসছে। সুরেশদা ওখানে একবার এসে পড়লে ঝামেলা হবে। তাই আচমকা ওঁর ওপর চড়াও হয়ে বেঁধে কাজের লোকদের চোখ এড়িয়ে আউটহাউসে রেখে এসেছিল। কাউকে খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা আসেনি, কিন্তু তাড়াহুড়োর মধ্যে সেটা ঘটে গেছে। ফলে একজনের নয় –দু'-দু'জনের প্রাণ গেছে।"

"আপনি এই থিওরিতে বিশ্বাস করেন স্যার?"

"কে জানে! আসলে ... থাক সে কথা।"

"থাকবে কেন স্যার!"

"আসলে এই নিয়ে কনকদা, অজয়দা আর আমি বহুদিন আলোচনা করেছি, কিছুই এগোয়নি। অজয়দা বলতেন, আমাদের থিওরি কে শুনবে বল, পুলিশের কাছে কেস ইজ ক্লোজড।"

“আপনাদের থিওরি কী ছিল স্যার?”

“থিওরি মানে –পুলিশ লালাকে অনেক জেরা করেও পরে ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ লালা নাকি খুনের দিন মেদিনীপুরে ওর শ্বশুরবাড়িতে ছিল। সেটা সত্যি নাও হতে পারে। ওকে নাকি বনগাঁয় এক চায়ের দোকানে কেউ দেখেছিল। বনগাঁ এখান থেকে বড়জোর মাইল দশেক দূরে।”

“মাই গড!”

“কোনটে সত্যি কে জানে! তবে শুনেছি খুনিদের পরে অনেক অনুশোচনা হয়। সেইজন্যেই হয়তো পরে এসে এখানে অনেক কান্নাকাটি করে গিয়েছিল। বিশেষ করে বাণীবউদির কাছে।”

নামটা নতুন। আমরা একটু অবাক হয়েছি দেখে অঞ্জনা বললেন, “আমার শাশুড়ি।”

.

কানেকশনটা বুঝতে পারলাম। ইনিই ছিলেন সুরেশবাবুর স্ত্রী, যিনি পরে অজয়বাবুকে বিয়ে করেন। আমি হলে এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করতাম না। কিন্তু একেনবাবু সে পাত্তর নন।

“বুঝেছি স্যার, উনি সুরেশবাবুর স্ত্রী ছিলেন, পরে অজয়বাবুকে বিয়ে করেন।”

“ঠিক। সুরেশদার সংসারটা ভেসে যাচ্ছিল। অজয়দাই হাল ধরেন। ছোট্ট ছেলেটাকে মানুষের মতো মানুষ করেন। কীরে ঠিক বলেছি?” বলে সস্নেহে অঞ্জনার দিকে তাকালেন কানাইবাবু।

অঞ্জনা সলজ্জে হাসল।।

এক্কেবারে রাইট স্টেটমেন্ট স্যার, সুবীরবাবু একজন পারফেক্ট জেন্টলম্যান। ভালো কথা, অজয়বাবু কী করতেন?”

“অজয়দা হাবড়ায় একটা কারখানায় ফোরম্যান ছিলেন। পরে কনকদা যখন ওর সাইকেল সারাইয়ের ব্যবসা বেচে দিয়ে লরির ব্যবসায় নামেন তখন অজয়দাও বন্ধুর সঙ্গে যোগ দেন। দুজনে মিলে ব্যবসাটা বেশ বড় করে ফেলেছিলেন। এখানকার প্রায় সব ব্যবসায়ীই ওঁদের লরি ব্যবহার করতেন।

তারপর বছর পাঁচেক আগে অজয়দা আর বউদি গাড়ি করে বেনারস যাবার পথে অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। সে বছরই তো তোদের বিয়ে হবার কথা ছিল –তাই না?”

“হ্যাঁ,” অনুচ্চস্বরে অঞ্জনা বলল।

“ওদের বিয়েটা এক বছর পিছিয়ে গেল। তারপর কনকদাও ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। তারপর তো গত বছর উনিও চলে গেলেন, নাতি-নাতনি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না।”

অঞ্জনা দেখলাম একটু লাল হলেন। বললেন, “আপনারা গল্প করুন, আমি যাই রাত্রির রান্নার জোগাড় করি।”

“আমরাও এখুনি উঠব ম্যাডাম।”

“না, না, আপনারা কথা বলুন না,’ বলে অঞ্জনা বিদায় নিলেন।

অঞ্জনা চলে যাবার পর একেনবাবু বললেন, “আপনারা সময় আর বেশি নষ্ট করব না স্যার- লালাবাবু ছাড়া আর কারোকে সন্দেহ হয়?”

“তেমন তো কাউকে মনে করতে পারছি না। আর সত্যি কথা বলতে কী, লালার ব্যাপারটাও নিতান্তই সন্দেহ। পুলিশ নিশ্চয়ই ওর অ্যালিবাই ভেরিফাই করেছিল।”

“করা তো উচিত ছিল স্যার। অ্যালিবাই যাঁর ছিল না, তিনি হলেন গজলালবাবু। ঠিক কি না স্যার?”

“তা ঠিক। গজলালের বিরুদ্ধে প্রমাণের অন্ত নেই। কিন্তু সুরেশদাকে গজলাল পছন্দ করত। কে না করত। গান পাগলা লোক ছিলেন। কথায় কথায় গানের কলি আওড়াতেন। প্রায়ই বলতেন গান গেয়ে যদি পেটে ভাত জুটত, তাহলে চাকরি বাকরি ছেড়ে শুধু গান নিয়েই পড়ে থাকতেন। ওগুলো অবশ্য কথার কথা। হিসেবিও ছিলেন যথেষ্ট। জদগীশনারায়ণের চাকরিটা ওঁর না নিলেও চলত। আমরা খ্যাপাতাম, বুড়ো মরলে সুরেশদা টু-পাইস পাবেন –সেইজন্যেই সুরেশদা কাজ নিয়েছেন। যাক সে

কথা, সুরেশদার কথা বলতে শুরু করলেই আমি ইমোশনাল হয়ে পড়ি। তবে হ্যাঁ, গজলালের ব্যাপারে আমার আরও একটা খটকা ছিল।”

“কী স্যার সেটা?”

“সুরেশদা অনেককে ভুল নামে ডাকতেন। গজলালকে উনি বরাবর জগলাল ডেকে এসেছেন। যেমন লালাকে ভালা। ভুল ধরিয়ে দিলেও একবার দু’বার ঠিক বলতেন, তারপর আবার সেই এক ভুল। এমনকী লালা যখন সুরেশদাকে এসে হুমকি দেয়, আমরা সুরেশদাকে থানায় ডায়রি করতে বলি। সুরেশদা সেই ডায়রি করে এসেছিলেন ভালার নামে। সেই নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করেছিলাম। সেইজন্যেই আমার মনে হয়েছিল– উনি জগলাল না লিখে গজলাল লিখলেন কেন। হতে পারে উনি অনেক ভাবনাচিন্তা করে ঠিক নামটাই লিখেছিলেন। তাও একটা খটকা থাকে।”

“ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট স্যার। ও হ্যাঁ, আপনি তো জানেন, উনি সাংকেতিকভাবে গজলালবাবুর নাম লিখেছিলেন।”

“হ্যাঁ, তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। উনি জানতেন, আর কেউ না হোক-কনকদা বা অজয়দা ওটা বুঝবেন। নিজেদের মধ্যেও ওঁরা গোপনে এইভাবে কথা চালাচালি করতেন।”

“আপনি কী করে জানলেন স্যার?”

“সেটা একটা মজার ব্যাপার। একবার কনকদার কাছে গ্রামের কয়েকটা ছেলে এসেছিল সুরেশদার লেখা চিঠি নিয়ে। চিঠিতে ছিল, ‘ভাই কনক, আমার হয়ে ওদের হাতে একশো টাকা দিও, পরে তোমায় আমি দিয়ে দেব বা ওই রকম কিছু। কনকদা চিঠি পড়ে টাকা না দিয়ে ছেলেগুলোকে ভাগিয়ে দিল। ওরা চলে যাবার পর আমি বললাম, “তাড়িয়ে দিলেন ছেলেগুলোকে –সুরেশদা নিশ্চয়ই দুঃখ পাবেন।’ ‘কেন দুঃখ পাবে। ওই তো লিখেছে –NO। দেখলাম নীচে সুরেশ নামের পেছনে লেখা 14 15। অ্যালফাবেটের ১৪ নম্বরে N আর ১৫ নম্বরে O।” ।

“ভেরি ক্লেভার স্যার। আচ্ছা, জগদীশনারায়ণ যেদিন মারা যান, সেদিন তো ১৫ই অগাস্ট ছিল তাই না?”

“ঠিক তাই।”

“পুলিশ রিপোর্টে দেখেছিলাম স্যার, কাজের লোকেরা সুরেশবাবুর খোঁজে স্কুলে গিয়েছিল। সেখানে সুরেশবাবু ছিলেন না। স্কুলের পাশে এক মাস্টারমশাই থাকতেন, তিনিই পুলিশকে খবর দেন। সেই মাস্টারমশাই কে আপনি জানেন?”

“অনাদিবাবু, তিনিও গত হয়েছেন।”

“১৫ই অগাস্ট ছুটির দিন –কাজের লোকগুলো স্কুলে সুরেশবাবুর খোঁজ করতে গিয়েছিল কেন?” একেনবাবু নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলেন।

“আমার ধারণা ওরা ভেবেছিল সুরেশবাবু তখনও ওখানে আছেন। ওই দিন স্কুলে সকালবেলা ফ্ল্যাগ তোলা হতো, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো। একটা ফাংশনও হতো। স্কুলে ছাত্রদের গান সুরেশদাই শেখাতেন। ফাংশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুরেশদা ওখানে থাকতেন। দুপুরের একটু আগে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু সেদিন সেখান থেকে সুরেশদা আর বাড়ি ফেরেননি। কোনো কাজে জগদীশনারায়ণের কাছে গিয়েছিলেন। সেটাই কাল হল।”

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।”

.

বাড়ি ফেরার পথে দেখি একেনবাবু একটু পিছিয়ে পড়েছেন। এক মনে ডায়েরি বার করে কাগজে কী সব আঁকিবুকি কাটতে কাটতে হাঁটছেন।

“কী বুঝছেন?” ঘাড় ঘুরিয়ে একবার জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর নেই।

"কী মশাই, একেবারে মৌনীবাবা হয়ে গেলেন যে!" প্রমথ ধমকের সুরে বলল।

"ভাবছি স্যার।"

"কী ভাবছেন এত?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ছাড়ান দে," প্রমথ বলল। "এখন নানারকম নকশা চলবে ওঁর।"

যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন সুবীরবাবু ফোনে জানি কার সঙ্গে কথা বলছেন।

"না, কালকে এখানে কোনো জায়গা নেই। আপনারা নেক্সট উইকে আসবেন বলেছিলেন... আমি বুঝতে পারছি তিন মাস আপনারা থাকবেন, কিন্তু গেস্টদের তো আমরা চলে যেতে বলতে পারি না।"

হঠাৎ একেনবাবু সুবীরবাবুকে ইশারা করলেন। সুবীরবাবু ফোনের মুখে হাত দিয়ে বললেন, "কী?"

"ওঁদের আসতে বলুন স্যার, আমরা কাল সকালেই চলে যেতে পারি।"

"না, না, সে কী কথা, আপনারা দু'দিনের জন্য থাকবেন ঠিক করে এসেছেন।"

"প্লিজ স্যার, বলুন –আপনার এই ক্ষতি আমরা হতে দেব না।"

সুবীরবাবু কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে একেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে কাল বিকেলে ঘর খালি হবে, আপনারা আসুন।"

ফোনটা নামিয়ে সুবীরবাবু বললেন, "ছি, ছি, এটা কী বিশ্রী হল।"

"কিচ্ছু বিশ্রী হল না স্যার। তিন মাসের জন্য আপনি গেস্ট পাচ্ছেন, এক রাতের জন্য তাকে খোয়াবেন, এটা একটা কথার কথা হল?"

একেনবাবু ব্যাপার দেখে আমি অবাক। এর মধ্যেই ওঁর তদন্ত শেষ!

"আপনার তদন্তের কী হল?" অঞ্জনা প্রশ্ন করলেন।

"বুঝলেন, ম্যাডাম, বাইশ বছরের পুরনো রহস্যের উদঘাটন দু'দিনে হবে না। তবে কানাইবাবু বেশ ইন্টারেস্টিং লোক-আর আপনাদের খুব ভালোবাসেন মনে হল।"

“হ্যাঁ, আমাদের আপন কাকার মতো। কিন্তু আপনারা কালই চলে যাবেন ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগছে। কিছুই খাওয়াতে পারলাম না।”

“সে কী কথা!” প্রমথ বলল, “কানাইবাবুর কাছে যাওয়ার জন্য মেনু কম হল নাকি?”

“তা হল না। তবে কালকের মেনু তো বাদ পড়ল।”

সুবীরবাবু বললেন, “সত্যি, আপনারা আসাতে ও খুব খুশি হয়েছে।”

“খুশি তো আমাদের হবার কথা। উনি খাটছেন আর আমরা খাচ্ছি।”

৬. রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে

ফেরার পথে রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে দেখলাম একেনবাবু ভীষণ গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন।

“কী এত ভাবছেন?”

“ভাবছি স্যার, মার্ডারটা ঘটেছিল একটা খুব শুভদিনে –আমাদের স্বাধীনতা দিবসে।”

প্রমথ বলল, “সো?”

“কিছুই না স্যার,” বলে হঠাৎ ঘ্যানঘ্যানে গলায় শুরু করলেন, “জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে,—-।”

“থামুন তো মশাই” প্রমথ ধমকে উঠল। “দেখছেন বাপি গাড়ি চালাচ্ছে।”

“থামছি স্যার।”

শব্দটা থামালেন, কিন্তু ওঁর মুখ নাড়ানো দেখলাম বন্ধ হল না। বাস্তবিকই খ্যাপা লোকটা।

“এবারের যাত্রাটা আপনার অকারণেই হল,” প্রমথ বলল। “তবে বারে বারে কী আর পাশ হয়, মাঝে মাঝে তো ফেলও মারতে হয়।”

“তা হয় স্যার, কিন্তু এবার ফেল মেরেছি বলছেন কেন?”

“কারণ অঞ্জনাকে প্রকারান্তরে তাই বলে এলেন।”

“তা এলাম স্যার।”

“সেটা সত্যি নয়।”

“কে জানে স্যার, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।”

“যেটুকু জানেন, সেটুকুই বলুন না, এখানে আমি আর বাপি ছাড়া তো কেউ নেই।”

“এখন বললেন স্যার বাপিবাবুর কনসেন্ট্রেশন থাকবে না, একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে।”

“এই বাপি একটা ধাবায় গাড়ি দাঁড় করা তো। চা খাব আর ওঁর কেরামতির খবর শুনব।”

“আপনি না স্যার, সত্যি।”

.

একটু বাদেই একটা ভদ্রগোছের ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করালাম।

চা, তাওয়া রুটি আর ডাল মাখানি অর্ডার দিয়ে দূরের একটা বেঞ্চিতে নিরিবিলিতে বসলাম।

“এবার বলুন,” আমি বললাম।

একেনবাবু শুরু করলেন। “গজলালের বিরুদ্ধে কেসটা জোরদার হয়েছে দুটো কারণে। ওঁর কাছে হিরেটা ছিল। উনি অস্বীকার করেননি যে ওটা জগদীশনারায়ণের কাছ থেকে পাওয়া; আর দ্বিতীয় হল গজলের নামটা দেয়ালে মরার আগে সুরেশবাবু লিখে গিয়েছেন। সোজাসুজি নয়, সাংকেতিক ভাবে। তাই তো স্যার?”

“ইয়েস।” আমি আর প্রমথ দু’জনেই একসঙ্গে বললাম।

“কিন্তু স্যার একটা গাছে তো দু’ধরনের ফুল হয়-দেখলেন তো কাল।”

একেনবাবু যে কী বলতে চাইছেন –মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। “হোয়াট ডু ইউ মিন?”

“আমি বলতে চাচ্ছি স্যার, আমরা হয়তো ভাবছি গাছটা লাল, তারপর হঠাৎ দেখলাম বেগুনি।”

“কী হেঁয়ালি শুরু করেছেন মশাই, একটু ঝেড়ে কাশুন না!” প্রমথ ধমক লাগালো।

“যদি ভাবা যায় স্যার, ‘গজলাল’ নামটা সুরেশবাবু লিখতে চাননি। আর কানাইবাবু তো বললেন গজলালের নাম লিখতে চাইলে উনি লিখতেন ‘জগলাল।”

“ননসেন্স! তাহলে কী লিখতে চেয়েছিলেন?” প্রমথ ধমক লাগাল।

“সেটাই স্যার আমি ভাবছিলাম। সংখ্যাগুলো আবার দেখুন,” বলে পকেট থেকে ওঁর ডায়রির একটা পাতা ছিঁড়ে লিখলেন।

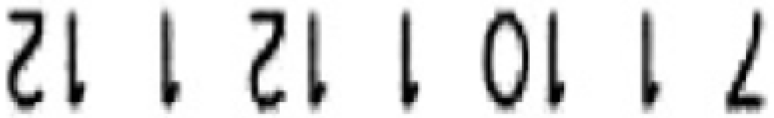

“আমরা জানি স্যার, অ্যালফাবেট গুণে গুণে দেখলে-A হল ‘1’, B হল ‘2’, এইভাবে চললে G হল ‘7’, J হবে ‘10’, আর L হবে ‘12’। উনি পেছন ফিরে লিখছিলেন স্যার, তাই পুলিশ ওটাকে ঘুরিয়ে পড়েছিল 7 1 101 12 1 12। তাই পেয়েছিল GAJALAL। ধরুন, আমরা সেটা না করে পড়ি, 12 1 12 1 01 17। তাহলে কী দাঁড়াবে, LALA 01 AG।....”

“ওয়েট এ মিনিট!” আমি বলে উঠলাম।

“দাঁড়ান স্যার, আমার বলা শেষ হয়নি। সংখ্যাগুলোকে একটু অন্য রকম করে লিখছি 12 1 12 10 11 7- এবার পড়ুন....।”

“LALA 0 KG। ও মাই গড! ওই ঘোষের পো কালীচরণ না কি জানি তার নাম সেটা তো KG হবে!”

“রাইট স্যার।”

“তার মানে তো ওই দুজনকেই খুন করেছে!”

“আপনি আমার পয়েন্ট মিস করছেন স্যার। লালাবাবুর অ্যালিবাই নিশ্চয়ই পুলিশ খতিয়ে দেখেছিল এবং তাতে কোনো ফাঁক পায়নি। যেটা আমি বলতে চাচ্ছি স্যার, সেটা হল সংখ্যাগুলোর মধ্যে নানান জিনিস লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা অর্থ খুঁজে বার করে সেটাকেই ধ্রুব সত্য মনে করলে বিরাট ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়।”

“এটা মন্দ বলেননি।” আমায় মানতে হল।

“আমার একটা থিওরি আছে,” প্রমথ বলল, “যদিও প্রমাণ করতে পারব না।”

“কী থিওরি?”

“সুরেশবাবু খুন হয়েছেন অবৈধ সম্পর্কের জেরে। সুরেশবাবুর অরিজিনাল স্ত্রী-মানে ওই বাণীবউদি আর অজয়বাবুর মধ্যে প্রেম ছিল। দু’জনে শলা করে সুরেশবাবুকে খুন করেছিলেন। কী একেনবাবু, ঠিক বলছি কি না বলুন?”

“আপনি স্যার আমার ভাত মারবেন।” একেনবাবু প্রমথকে বললেন।

“গুড, এবার প্রমাণ করুন, কেন আমি ঠিক বলছি।”

“সেখানেই মুশকিল স্যার। তবে কিনা সেটা যদি সত্যি হতো, তাহলে সুরেশবাবু ওইভাবে নামের কু দিতেন না।”

“তার মানে?” প্রমথ প্রশ্ন করল।

“মানে স্যার, সুরেশবাবু খুনিকে ধোঁকা দেবার জন্যে এই রকম সংখ্যার কোড ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু অজয়বাবুর কোডটা জানা ছিল, সুতরাং অজয়বাবু খুনি হলে সুরেশবাবু অন্যভাবে খুনির নাম লিখতেন।”

দ্যাট্‌স ট্রু। কথাটা অযৌক্তিক নয়। আমি ভাবার চেষ্টা করছিলাম, একেনবাবু ঠিক কোনদিকে এগোচ্ছেন।

ধাবার সার্ভিস খুব ফাস্ট। এর মধ্যেই আমাদের খাবার এসে গেল। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে একেনবাবু বললেন, "যেটা প্রশ্ন, সেটা হল এই সংখ্যাগুলো সুরেশবাবু অন্য কোনো কোড ব্যবহার করে লিখেছিলেন কি না।"

"অন্য কোনো কোড!"

"কেন নয় স্যার, নইলে খুনিকে ধরাবেন কী করে?"

"খুনিকে ধরাবেন মানে? আপনি কি প্রমথর স্টুপিড থিওরিটা ঠিক বলে ভাবছেন?"

"চুপ কর, আমার কোনো থিওরি স্টুপিড নয়।" প্রমথ গর্জন করল।

"প্রমথবাবুর থিওরি ঠিক না ভুল জোর করে বলতে পারব না স্যার, তবে আমার নিজের আরেকটা থিওরি আছে।"

"কী সেটা?"

"গজলাল যে জগদীশনারায়ণকে হিরের জন্যে পনেরো লক্ষ টাকা দেবে-সেটা সুরেশবাবু ওঁর প্রাণের বন্ধু অজয়বাবু আর কনকবাবুকে জানিয়েছেন। প্ল্যান ছিল টাকাটা পাওয়া মাত্র ওঁরা তিনজন জগদীশনারায়ণকে খুন করবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে সুরেশবাবুর উপর পুলিশের সন্দেহটা পড়বে। সুতরাং ঠিক করা হল, সুরেশবাবুকে হাতমুখ বেঁধে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে আটকে রাখা হবে। সেক্ষেত্রে পুলিশ এসে মনে করবে- ডাকাতরা সুরেশবাবুকে বেঁধে সিন্দুকের চাবি কেড়ে নিয়ে জগদীশনারায়ণকে খুন করে হিরে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। তবে একটু ভাবলেই বোঝা যায় স্যার, প্ল্যানটা অত্যন্ত কাঁচা। একটা খুনই যদি করতে হয়, তাহলে ডাকাতদের দুটো খুন করতে অসুবিধা কী? এইভাবে বেঁধেহেঁদে একজনকে ঘরে আটকে রাখা অনেক বেশি রিস্কি-পুলিশের মনে সন্দেহ জাগবে।"

যাক সে কথা। এবার জিনিসটা একটু ইন্টারেস্টিং অবস্থায় পৌঁছল। পুলিশ সার্ভেন্টস কোয়ার্টার সার্চ করল না। সুরেশবাবু ওখানেই আটকা পড়ে রইলেন। তখন কনকবাবু আর অজয়বাবু চাইলে পুলিশকে

জানাতে পারতেন যে, ওঁরা খুঁজতে খুঁজতে সুরেশবাবুকে পেয়েছেন-উনি সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে বাঁধা পড়ে রয়েছেন। কিন্তু ওঁরা ভেবেচিন্তেই সেটা করলেন না। সুরেশবাবু যদি উদ্ধার হন, পুলিশ গজলালকে আটক করলেও সন্দেহের তীর সুরেশবাবুর ওপরও থাকবে। পুলিশ যদি হঠাৎ সুরেশবাবুর বা সন্দেহবশে ওঁদের বাড়ি সার্চ করে, তাহলে টাকার হদিশ পেয়ে যাবে। সুরেশবাবুর সঙ্গে অজয় এবং কনকও ধরা পড়বেন। ওঁরা তাই কিছুই করলেন না, বন্ধুকে তিলে তিলে মরতে দিলেন।”

“মাই গড!” আমি বললাম।

“দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি বলতে চান, ওই বাণীবউদি ক্যারেক্টার এই খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না! বরকে খুন করে প্রেমিকের ঘর করা তো স্ট্রং মোটিভেটর।”

“হু নোজ স্যার। তবে কি না, সুরেশবাবুর মৃত্যুর পর অজয়বাবু যদি শুধু বন্ধুর বৌকে পেতেন- তাহলে আপনার থিওরিটা জোরদার হত। কিন্তু এক্ষেত্রে অজয়বাবু আর কনকবাবু-দু’জনেই বেশ কিছু টাকারও মালিক হয়েছিলেন। সাইকেল সারানোর ব্যবসা থেকে কনকবাবু লরির ব্যবসা শুরু করেছিলেন। অজয়বাবু চাকরি ছেড়ে তাতে যোগ দেন। এই ব্যবসায় তো অনেক ক্যাপিটাল লাগে। হঠাৎ টাকাগুলো এল কোত্থেকে? তারপর ঐ সুন্দর ছায়ানীড় বাড়িটা- সেটা বানাতেও তো পয়সা লেগেছিল অনেক। না স্যার, আমার মনে হয় টাকার ব্যাপারটাই মুখ্য। যদিও মানি স্যার, এইসব অবৈধ সম্পর্ক থেকে অনেক খুনোখুনি হয়।”

“প্রমথর থিওরি বাদ দিন, আপনি আপনার কথাটা শেষ করুন,” আমি বললাম।

“আমার ধারণা টাকাটা কনকবাবু আর অজয়বাবুর কাছে ছিল। সুরেশবাবুকে উদ্ধার করলে, তাহলেই উনি ভাগ পেতেন। তিনি বেঁচে না থাকায় অজয়বাবু আর কনকবাবুর ভাগটা বাড়ল। একের তিন না হয়ে আধা।

যাই হোক, সুরেশবাবু যখন বুঝতে পারলেন বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন মরার আগে দেয়ালে ওদের নাম লেখার চেষ্টা করলেন। এবিসিডি কোড বন্ধুরা জানে। নতুন কী কোড ব্যবহার করা যায়? গান পাগলা মানুষ, হয়তো ওঁর মনে হয়েছিল ১৫-ই অগস্টে খুন হয়েছে।

এই গানটা সেই দিনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত-সুতরাং যাঁরা ওঁর সঙ্কেত বোঝার চেষ্টা করবেন তাঁদের মাথায় সেটা থাকবে। তাও একটা হিন্ট দেবার জন্যে দুটো অক্ষর NA নীচে জুড়ে দিলেন। NA মানে National Anthem।”

“আই সি, কিন্তু তাহলে কী দাঁড়ায়?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “গুণে দেখুন স্যার, আমি গাইব না, গাইলে প্রমথবাবু আবার বকবেন। এই নিন স্যার, এই ছিল সুরেশবাবুর কোড-7 1 101 12 1 12। তবে কোডটা একটু অন্যভাবে পড়ুন। এই ভাবে 71 10 11 2 11 2। সংখ্যাগুলো এক-শুধু দুটো পেয়ার একটু আলাদা ভাবে লিখলাম।”

আমি আর প্রমথ জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে-র অক্ষর গুণে গুণে লিখতে লাগলাম। জ হল 1, ন হল 2, গ হল 3, ণ হল 4, ম হল 5, ন হল 6, অ হল 7, ধি হল ৪, না হল 9, 10 হল য় আর 11 হল ক। তাহলে 7 1 10 11 2 11 2 দাঁড়াচ্ছে: অজয় কনক ২- ও মাই গড!

আমি আর প্রমথ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

“আমার মনে হয় সুরেশবাবু ভাবেননি স্যার যে সংখ্যাগুলো অ্যালফাবেটের পজিশন হিসেবে সাজালে গজলাল হয়ে দাঁড়াবে!” একেনবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন।

“সাধু, সাধু, প্রমথ বলল। “নাঃ, আপনার কল্পনাশক্তিকে সেলাম না ঠুকে পারছি না। কিন্তু এইরকম আরও কিছু কল্পনাশক্তি লাগালে তো যাকে খুশি তাকেই খুনি বানিয়ে ফেলতে পারেন!”

“তাই তো বললাম স্যার, এটা নিতান্তই থিওরি।”

“তা হোক থিওরিটা মন্দ নয়, এটা সত্যি হওয়াও সম্ভব।” আমি বললাম।

“তোর মুণ্ডু!” আমাকে নস্যাৎ করে প্রমথ একেনবাবুকে বলল, “তা গোয়েন্দামশাই, এই কীর্তির কথা সুবীর আর অঞ্জনাকে বলে এলেন না কেন? ওদের কাছে তো হেরো হয়ে ফিরলেন।”

“কী যে বলেন স্যার। আমার থিওরি ঠিক হলেও ওঁদের বাবাদের কুকর্মের জন্যে তো ওঁরা দায়ী নন। ওয়ান্ডারফুল কাপল স্যার, জাস্ট ওয়ান্ডারফুল!”

The End